ABSSRK
ESTD : 2002

ডাঃ অমিতাভ বসু স্মৃতি স্বাস্থ্যরক্ষা কেন্দ্র

স্বাস্থ্যের সন্ধানে

জুলাই - ডিসেম্বর, ২০২৬

ISO 9001:2015

পরিচালনায়

NABL M(EL)T LABS

নিমতা ডাঃ অমিতাভ বসু স্মৃতিরক্ষা কমিটি

REGD No: S/1L/17070

১৯, এম বি রোড, শ্রয়ণ অ্যাপার্টমেন্ট, নিমতা

কোলকাতা - ৭০০০৪৯ (নিমতা হাই স্কুলের পাশে)

Phone : 2513-7070/7439 , 2539-2009

8585882287/9051132429/9051129713/9038721959

Email : nimtaabasusmriti@gmail.com

Website : www.abssrk.online

সম্পাদকের কলমে—

সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিক সহযোগিতায় 'স্বাস্থ্যের সন্ধানে' পত্রিকার আর একটি সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এ কাজ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আসলে নিমতা ডাঃ অমিতাভ বসু স্মৃতিরক্ষা কমিটি সব সময়ই তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বদ্ধপরিকর। তথাপিও বিভিন্ন ধরনের অপ্রীতিকর, প্ররোচনামূলক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের বিভিন্ন সময়ে। একথা অনস্বীকার্য যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যাপ্তি দিন দিন বেড়ে চলেছে, তাই আমাদের কাজের পরিধিও ক্রমবর্ধমান। আমরা সবসময়েই সঠিক পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে দেওয়ার চেষ্টা করি যে কোনো মূল্যে—একথা সর্বজনবিদিত। প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র আধুনিকীকরণে এবং উন্নতমানের পরিষেবা প্রদানে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট। সকল শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষের আন্তরিক সহযোগিতায় ডাঃ আমিতাভ বসু স্মৃতি স্বাস্থ্যরক্ষা কেন্দ্র পরিষেবা প্রদানে তার সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছবে এ ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।

নিমতা ডাঃ অমিতাভ বসু স্মৃতিরক্ষা কমিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিচালনার পাশাপাশি সামাজিক স্বাস্থ্য ও এলাকায় সুস্থ সংস্কৃতি রক্ষায় বিভিন্ন ধরনের জনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে বিভিন্ন সময়ে। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, প্রবীণদের হাঁটা প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন ধরনের টিকাকরণ কর্মসূচি, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা, স্বাস্থ্য শিবির, ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, কর্মী, সদস্য ও নিমতা এলাকার স্কুলগুলোতে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতি ও সফল পরীক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান, স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ এই কর্মসূচির অন্তর্গত।

বিভিন্ন রকম সীমাবদ্ধতার কারণে খুব বেশি সংখ্যক পত্রিকা প্রকাশ করতে পারিনা, তবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রকাশিত সমস্ত পত্র-পত্রিকা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমস্ত রকম খবরাখবর আমাদের ওয়েবসাইটে (www.abssrk.online) দেওয়া থাকে। আপনাদের নিয়মিত আমাদের ওয়েবসাইট দেখার অনুরোধ রইলো।

আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন, 'স্বাস্থ্যের সন্ধানে' পত্রিকা পড়ুন, গঠনমূলক সমালোচনা করুন। আমরা আমাদের ত্রুটি - বিচ্যুতি সংশোধন করতে সবসময়ই আগ্রহী। আপনাদের সুস্থ সমালোচনা আমাদের ভবিষ্যৎ কাজকর্মকে আরো সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলবে এ আশা রাখি।

ধন্যবাদান্তে—

পুলক পাল

(সম্পাদক)

নিমতা ডাঃ অমিতাভ বসু স্মৃতিরক্ষা কমিটি

স্বাস্থ্যরক্ষায় পরিবেশের ভূমিকা

ডাঃ জ্যোতিপ্রসাদ ব্যানার্জি, MBBS, DTM & H, DGO

জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি সমস্যা সারা জীবন ধরে আমাদের তাড়া করে বেড়ায়। এর হাত থেকে নিস্তার কারুর নেই - তবে কারো ক্ষেত্রে কম, কারো বেশি। আবার কেউ সারা জীবন ধরে সমস্যা ভোগ করে। যার কথা বলছি তার নাম 'ব্যাধি'। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু—আমাদের জীবনের অঙ্গ, অবশ্যম্ভাবী এর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। ''**জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে''**, এই কথাটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু ব্যাধি সকলের ক্ষেত্রে সমান নয় - কারুর কম কারুর বেশি, কেউবা জন্ম থেকেই কোন দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে আসে।

আমার আজকের আলোচনার বিষয় হোল, এই ব্যাধির মধ্যে কোন জাতীয় অসুখ আমরা সচেতন হলে বা কিছু নিয়ম মেনে চললে খানিকটা প্রতিহত করা যায় এবং এই সব ব্যাধির পিছনে কোন প্রাকৃতিক বা পরিবেশের ভূমিকা থাকে।

আপনারা সবাই জানেন থ্যালাসেমিয়া কি ভয়ংকর অসুখ, জন্ম থেকে যে কদিন বেঁচে থাকে, মা-বাবা, নিজে (রোগী) কি অসম্ভব কষ্ট পায় এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেনা অথচ বিয়ের আগে একটি সামান্য রক্ত পরীক্ষা (মা এবং বাবার) করলেই বোঝা যায় এদের সন্তানের কোন সমস্যা হতে পারে কি না? অজ্ঞতা এবং অশিক্ষা এই দুই কারণে এমন হয়ে থাকে।

এছাড়া অনেকে কিছু জন্মগত ত্রুটি নিয়ে (হার্ট, মেরুদন্ড) জন্মায় - অথচ মাতৃগর্ভে থাকাকালীন এই ত্রুটিগুলি নতুন, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যায় - একটু সচেতনতা প্রয়োজন।

কিছু কিছু মারণ ব্যাধি (টিটেনাস, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি) ইত্যাদি এখন প্রায় দেখাই যায় না - এর প্রধান কারণ আমাদের সচেতনতা এবং সরকারি, বেসরকারি প্রচেষ্টা আগের থেকে অনেক বেড়েছে (এটা আমি আগেও একটা প্রবন্ধে আলোচনা করেছি)।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমাদের শিক্ষার হার বাড়া সত্ত্বেও কিছু ব্যাপারে আমরা এখনো উদাসীন - আমরা জেনে বুঝেও কোন কোন ব্যাপারে উদাসীন থাকি - একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব।

যেমন ধরুন স্মোকিং - সবাই জানে, সরকারি প্রচার আছে, সিগারেট প্যাকেট এর উপর সাবধান বাণী লেখা থাকে - তা সত্ত্বেও সিগারেট খাওয়া কি বন্ধ হয়েছে? অথচ সিগারেট থেকে কিছু মারণব্যাধি (সিওপিডি, হাঁপানি এমনকি ক্যান্সার) পর্যন্ত হতে পারে। এটা আমরা সবাই জানি, ডাক্তারবাবু নিষেধ করেন, কিন্তু কিছু লোক উদাসীন থাকে - নিজেরও ক্ষতি করে আশেপাশের লোকও তার ফল ভোগে।

কিছু পরিবেশগত কারণও কিছু অসুখের কারণ কিন্তু ভেবে দেখুন পরিবেশ রক্ষা করা, পরিচ্ছন্ন রাখা, কিছু নিয়ম মেনে চলা - এগুলো আমরা নিজেরাই করতে পারি, প্রশাসন সব করে দেবে সব ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয়। আমরা তো বাড়ি, ঠাকুরঘর, বাগান নিজেরাই পরিষ্কার রাখি তাহলে বাড়ির সামনের রাস্তাটা নোংরা রাখব

কেন? বাড়ির আবর্জনাগুলো সঠিকভাবে নির্ধারিত জায়গায় ফেলবো না কেন? আমার বাড়ির সামনেটা নোংরা থাকলে তো আমারই ক্ষতি - অনেক রকম অসুখ ছড়াতে পারে। এছাড়া দৃশ্যদূষণ বলে একটা ব্যাপার আছে। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকলে শরীর ও মন দুই ভালো থাকে। ভাবুন তো কোন মন্দিরে বা স্কুল-কলেজে গিয়ে যদি অপরিচ্ছন্ন দেখেন তাহলে কেমন হবে?

আমরা সকলেই জানি বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে আমরা পালিয়ে আসি অপরিচ্ছন্নতার জন্য। চিকিৎসার মান কিন্তু এই সব হাসপাতালে খারাপ নয়। বহু রোগী ভালো হয়ে বাড়ি ফেরে। কিন্তু বেশিরভাগ অভিযোগ আসে অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে।

এছাড়া প্রায়ই দেখা যায় কোন রোগী হয়তো দীর্ঘদিন ধরে কোন দুরারোগ্য অসুখে ভুগছেন, তার ব্যবহৃত জামাকাপড়, গজ, তুলো প্রতিদিন রাস্তার ধারে ফেলছেন। এতে রোগীর ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ থেকে নানা ধরনের প্রাণঘাতী জীবাণু বাতাসে বা জলের সাথে মিশে আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে - আমরা জানতেও পারছি না। যারা কাজগুলি করছেন তারা যে অশিক্ষিত তা নয় - কিন্তু উদাসীন!

এছাড়া রাস্তাঘাটে যত্রতত্র মলমুত্র ফেলা - নিজেরা এবং কোন কোন সময় বাড়িতে পোষা কুকুর বা অন্য প্রাণী তাদেরও মলমূত্র ত্যাগের জায়গা হল রাস্তা বা নর্দমা। তার থেকেও পরিবেশ দূষণ হতে পারে এবং এই পরিবেশ দূষণ নানারকম অসুখ ছড়ায়।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো কাশির পর যত্রতত্র কফ, থুতু ফেলা। থুতু বা কফের সাথে অনেক জীবাণু থাকতে পারে, যেগুলি রোদ্দুর বা জলে মরে না বরং হাওয়ার মাধ্যমে নিঃশ্বাসের সাথে আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং শরীর দুর্বল থাকলে সেখানে থেকে বাসা বেঁধে প্রাণঘাতী হতে পারে।

এই ব্যাপারে আমার নিজের দেখা একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। কোন এক বাড়িতে একজন টিবি রোগী বাইরে থেকে কোলকাতায় চিকিৎসা করাতে এসে এই বাড়িতে ছিল। বিরাট পরিবার ১০-১২ জন সদস্য। সবাই পালা করে তার দেখাশোনা করত - একই ঘরে থাকতো।

কয়েক বছরের মধ্যে সেই বাড়ির ৮ - ৯ জন এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়। তৎকালীন ডাক্তার বাবুরা বলেছিলেন, রোগীর কফ থেকে (Sputum positive) এই রোগটি ছড়িয়েছিল। তখন টিবির উন্নত ওষুধ বার হয়নি।

আর একটা অসুখের কথা বলি - আমার চাকরির সূত্রে এটা আমি দেখেছি। আমি তখন ই.এস.আই হসপিটালে কাজ করতাম, প্রচুর শ্বাসকষ্টের রোগী আসত। তাদের বেশিরভাগ জুট মিল, গেঞ্জি তৈরির কারখানায় কাজ করতো। পাট বা সুতির যে ফাইবার বা কণাগুলো থাকে সেগুলি নিয়মিতভাবে ফুসফুসে প্রবেশ করার ফলে এদের শ্বাসকষ্ট, কাশি কমতেই চায় না - দীর্ঘদিন চলতে চলতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এইরকম আরেকটি অসুখের নাম Silicosis - যারা পাথর ভাঙ্গার কাজ করেন তাদের এটা হতে পারে উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা না নিলে। এই অসুখে ছোট ছোট পাথরের কণা নিঃশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করে ও ধীরে ধীরে ফুসফুসের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

পরিবেশ দূষণের আর একটা বড় কারণ হলো ধোঁয়া। বিভিন্নভাবে এই ধোঁয়া তৈরি হয়। বাড়িতে বা বাইরে কোন আবর্জনা পোড়ানোর ধোঁয়া, এই ধোঁয়া আরো বিপজ্জনক হয় যদি তাতে প্লাস্টিক বা কোনও রাসায়নিক জিনিস থাকে। এগুলি থাকলে শুধু শাসকষ্ট না ক্যান্সার, হার্ট বা কিডনি পর্যন্ত খারাপ হয়ে যেতে পারে। আপনারা সবাই জানেন দিল্লীতে শীতকালে এই ধোঁয়া থেকে যে দূষণ হয় তা সারা দেশের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবার জলের দূষণ থেকে কি কি অসুখ হতে পারে তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। বিশুদ্ধ পানীয় জল না পেলে তার থেকে অনেক রকম অসুখ (ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, কিছু ধরনের জন্ডিস) হতে পারে এটা আমরা জানি। কিন্তু জলপান না করলেও জল থেকে অনেক রকম চামড়ার অসুখ হতে পারে। গঙ্গাকে আমরা মা বলি, পবিত্র বলে ভেবে মাথায় দিই, স্নান করি। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই গঙ্গার জল এবং অন্যান্য ছোট নদী নালার জল এখন বিষাক্ত হয়ে গেছে।

এই জলের প্রসঙ্গে বলি, আমরা আগে জানতাম বৃষ্টির জল সব থেকে নিরাপদ এবং দূষণমুক্ত। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এখন বৃষ্টির জলও আর নিরাপদ নয়। এই বিষয়ে জানতে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা গত ২৩/০৫/২০২৬ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার চতুর্থ পাতার চিঠিপত্র কলামে আর্য গোস্বামীর (দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান) চিঠিটি পড়তে পারেন।

এই আলোচনার উদ্দেশ্য হল, পরিবেশ রক্ষা করে, সচেতন হয়ে আমরা অনেক ব্যাধির হাত থেকে বাঁচতে পারি। এর জন্য আমাদের সবসময় অন্যের উপর নির্ভর করতে হবে না।

আসুন সবাই মিলে একটু হাতে হাত লাগাই, ভালো থাকি, সুস্থ থাকি।

শিশুদের হরমোন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ডাঃ সায়ন্তন চক্রবর্তী, MD (Medicine), DM (Endocrinology)

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের Endocrine Disorders বলতে আমাদের হয়তো কিছুটা ধারণা আছে যেমন—Diabetes, Thyroid Disorders, Obesity, Menstrual Disorders ইত্যাদি, কিন্তু শিশুদের Endocrine Disorders নিয়ে সমাজে সচেতনতা কম। মা বাবাদের সচেতনতা না থাকার কারণে অনেক রোগ শিশুদের জন্ম থেকে বা অনেক কম বয়স থেকে থাকলেও সেগুলি ধারা পড়ে অনেক দেরীতে। তখন চিকিৎসা ঠিকমতো করা হলেও কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায় না। শিশুদের Common কিছু Endocrine Disorders নিয়ে তাই আজকের আলোচনা।

Pediatric Endocrine Disorders বলতে সবার আগে যেটা না বললেই নয় তা হলো Diabetes Mellitus। কিছু বছর আগে পর্যন্ত বাচ্চাদের Diabetes মানেই ছিল Type 1 Diabetes যার একমাত্র স্বীকৃত চিকিৎসা

আজও Insulin. কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে যেভাবে মানুষের খাদ্যাভ্যাস, জীবন যাপনের পরিবর্তন ঘটেছে তাতে Adolescent Diabetes এর একটা বড় অংশ এখন Type 2 Diabetes যার প্রধান কারণ অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস (Fast food, junk food) শরীরচর্চার অভাবের কারণে (Sedentary lifestyle এর কারণে তৈরী হওয়া Obesity এবং সেখান থেকে তৈরী হয় Insulin Resistance. MODY (Maturity Onset Diabetes of Young) বলে এক ধরনের Diabetes Young Generations এ দেখা যায় যাতে প্রধানত জিনগত ত্রুটির কারণে Pancreas থেকে Insulin তৈরী বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই প্রকার Diabetes বংশপরম্পরায় চলতে থাকে। যদি বাবা মায়েরা লক্ষ্য করেন বাচ্চা ঘনঘন Toilet এ যাচ্ছে, মাত্রাতিরিক্ত জল খেতে চাইছে, অল্প সময়ে অনেক খানি রোগা হয়ে গেছে তাহলে অবশ্যই ডক্তার দেখানো ও সুগার পরীক্ষা করা ভীষণ জরুরী।

Diabetes এর পরই যার কথা বলতে হয় তা হলো Thyroid Disorders. শিশুদের Hypo এবং Hyper দু'ধরনের Thyroid Disease ই দেখা যায় তবে Hypothyroid তুলনামূলক Common. ঠিকঠাক সময়ে চিকিৎসা না করলে শিশুদের Height Gain ঠিকমতো হয় না, স্মৃতিশক্তিতে প্রভাব ফেলে। Pubertal Progression (ছেলে ও মেয়েদের বয়োঃসন্ধির সময়ে যেসব শারীরিক পরিবর্তন ঘটে) বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এর পর আসি Pediatric Growth এর বিষয়ে। শিশুদের সঠিক উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু বিষয় খুব জরুরী যার মধ্যে রয়েছে Proper Nutrition এবং তার পাশাপাশি Thyroid Hormone এবং Growth Hormone ও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। Thyroid Hormone বা Growth Hormone এর Deficiency থাকলে শিশুদের উচ্চতা বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, বাবা - মায়েরা যদি লক্ষ্য করেন তাদের ছেলে বা মেয়ে তার সমবয়সী বাচ্চাদের তুলনায় ঠিকমতো বাড়ছে না তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন কারণ যত কম বয়সে এগুলো শনাক্ত করা যায়, ঠিকমতো চিকিৎসা করলে তত ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়। বয়স যত বাড়তে থাকে, তত Growth Potential কমতে থাকে। ১৬-১৮ বছর বয়সের পর উচ্চতা বাড়ার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না বললেই চলে।

এরপর আসি Pubertal Disorders এ। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য Puberty (বয়োঃসন্ধি) ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত ৯-১১ বছরের সময়কালে ছেলেদের ও মেয়েদের শরীরে নানা শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে। ছেলেদের শরীরে Testosterone এর অভাবে Testicular Volume বাড়ে, Penile Growth হয়, facial, pubic, axillary hair develop হয়। উচ্চতা অল্প সময়ের ব্যবধানে অনেকটা বেড়ে যায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে Estradiol এর প্রভাবে Breast Development হয়, Ovarian, Uterine Development হয়, উচ্চতা অল্প সময়ে অনেকটা বেড়ে যায়, Menstruation শুরু হয়। Pituitary Gland বা Gonads (Testis / Ovary) এর কোনো সমস্যার কারণে যদি এই সব Hormones ঠিকমতো তৈরী না হয় বা কাজ না করে তাহলে Pubertal Developement সময় অনুপাতে ঠিক মতো হয় না। সেটা অনেক সময় শিশুদের মধ্যে

Psychological Distress নিয়ে আসে। এই ব্যাপারে বাবা মায়েদের সচেতন হওয়া বিশেষ জরুরী। ছেলেদের ক্ষেত্রে যদি জন্ম থেকেই Testosterone এর ঘাটতি থাকে তাহলে সাধারণত Penile length কম হয় যাকে আমরা Micropenis বলি। মা বাবাদের যদি ছেলে সন্তানদের ক্ষেত্রে এরকম সন্দেহ হয় তাহলে জন্মের ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন কারণ এই বয়সে রোগ নির্ণয় যেমন সহজ হয় তেমনি চিকিৎসার Response ও তুলনামূলক ভালো হয়।

এতক্ষণ আলোচনা করলাম Pubertal Delay নিয়ে। এবার আলোচনা করা যাক Opposite topic নিয়ে। যেসব Sex Hormones নিয়ে আলোচনা হলো সেগুলো যদি সময়ের অনেক আগে শরীরে বেশী মাত্রায় ক্ষরণ হয় তাহলে Pubertal events গুলো সময়ের অনেক আগে চলে আসে, সেক্ষেত্রেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরী। ডাক্তারী ভাষায় আমরা একে Precocious Puberty বলি।

এবার কথা বলবো বর্তমান সময়ের একটি প্রবল আলোচিত বিষয় নিয়ে তা হলো Pediatric আর Adolescent Obesity। আগেই আলোচনা করেছি পরিমিত শরীরচর্চার অভাব, খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন শিশু ও কিশোরদের ওজন বৃদ্ধির পেছনে প্রধানত দায়ী। কম বয়স থেকে ক্রমাগত ওজন বৃদ্ধির কারণে একদিকে যেমন মেয়েদের Menstrual Problems, Ovarian disorders দেখা দিচ্ছে তেমনি অদূর ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস, Heart disease, fatty liver disease এই সব Non communicable Disease কে ডেকে আনছে। Regular physical exercise, Fast food, Junk food, Soft drinks বর্জন করা—এগুলো হলো Healthy lifestyle-এর অঙ্গ। Rarely Childhood Cushing disease এর কারণেও Childhood Obesity দেখা যায়। এই রোগে Adrenal Glands থেকে মাত্রাতিরিক্ত Cortisol hormone তৈরী হয় যা মূলত ওজন বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

Common Disease গুলোর পরে কিছু Rare disease নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করি। Vasopressin বলে একটা Hormone Posterior pituitary থেকে বেরোয় যার অভাবে মাত্রাতিরিক্ত Urine হয়। তাই শিশুদের যদি অতিরিক্ত প্রস্রাব হয় এবং যদি Diabetes Mellitus না থাকে তাহলে এই রোগটি আছে কিনা সেটা খোঁজ করা উচিৎ। শিশুদের হাড়ের গঠন ঠিকঠাক হওয়ার জন্য Vitamin D ভীষণ জরুরী । যদি Vitamin D Deficiency থাকে বা ঠিক মতো কাজ করতে না পারে তাহলে Growing Age এ শিশুদের long bones গুলো বেঁকে যায়। ডাক্তারী ভাষায় আমরা একে Rickets বলি।

নানাবিধ Pediatric Endocrine Disease নিয়ে আলোচনার শেষে শুধু এটা বলে শেষ করবো—এই সব রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ডাক্তারের থেকেও মা-বাবা, পরিবার পরিজনের ভূমিকা অনেক বেশী। তারা যত বেশী এই রোগগুলি নিয়ে, এদের উপসর্গ নিয়ে সচেতন হবেন ততবেশী এই রোগগুলি ধরা পড়বে প্রাথমিক অবস্থায় এবং তত দ্রুত এগুলির নিরাময় সম্ভব হবে।

শারীরিক সক্রিয়তা ও শরীরচর্চার সাথে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক

ডাঃ পলাশ দাস, MD

অধ্যক্ষ, কৃষ্ণনগর ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সাইন্সেস

শরীরকে সক্রিয় রাখা এবং শরীরচর্চা জীবন যাপনের অঙ্গ হিসেবে রাখা হল স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখার প্রথম ও প্রধান উপায়। পরিমিত ও গুণগত দিক থেকে খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য্য হলেও শরীরচর্চা স্বাস্থ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। যে উপকারগুলো শরীরচর্চার দ্বারা ঘটে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি।

শরীরচর্চার উপকারিতা ঃ

১। মূলত ঐচ্ছিক পেশী ও হাড়ের সরাসরি বৃদ্ধি ঘটায়। নিয়মিত শরীরচর্চার ফলে পেশী শক্ত ও পোক্ত হয়ে ওঠে। আর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে হাড়ের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে।

২। বিশ্রামকালীন রক্তচাপ (Resting BP) কমায়। এর দ্বারা উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ করে এবং উচ্চ রক্তচাপ বিশিষ্ট লোকেদের রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

৩। শরীরচর্চা ইনসুলিন নামক হরমোনের সক্রিয়তা বাড়ায়। ফলে শরীরে প্রবহমান গ্লুকোজের (শর্করা) খরচ বাড়াতে সাহায্য হয়। টাইপ টু ডায়াবিটিসের নিয়ন্ত্রণে এই বিষয়টি প্রভুত (৩৫—৫০%) পরিমাণে কাজ করে। রক্তে শর্করার হ্রাস ঘটিয়ে এই উপকারটি করে থাকে। রক্তের শর্করার বিপাকীয় প্রক্রিয়াটি এই হরমোনের সহায়তায় দ্রুত ঘটে।

৪। শরীরচর্চা শরীর অভ্যন্তরে অবস্থিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে থাকা তেল ও চর্বি কমায়। তেল ও চর্বি কমিয়ে তেল ও চর্বি সমস্যা, রক্ত সংবহন সম্পর্কিত রোগ (IHD), ইনসুলিন নির্ভর ডায়াবিটিস (NIDDM) ইত্যাদি রোগের প্রকোপ হ্রাস করে।

৫। শরীরচর্চা শরীরের রক্তে অবস্থিত তেল ও চর্বিকে স্বাভাবিক অবস্থার দিকে নিয়ে আসে। উপকারী তেল ও চর্বি (HDL) বাড়ায়, অপকারী তেল ও চর্বি (LDL, TG, Cholesterol) কমায়। তেল ও চর্বি (লিপিড) শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের ফলে স্বাভাবিক মাত্রায় রক্তে স্থিতি লাভ করে।

৬। শরীরচর্চাহেতু রক্তচাপ হ্রাস, লিপিডের স্বাভাবিক স্থিতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে থাকা তেল ও চর্বি হ্রাসের কারণে রক্ত সংবহন তন্ত্রের রোগ হ্রাস পায়। হার্টের পেশীর অক্সিজেন চাহিদা কমে। প্রতি পেশী সঙ্কোচন আঘাতে রক্তের পরিমাণ বাড়ে এবং ফলে রক্ত সংবহন বাড়বে। হৃদপিণ্ড পেশীতে সমান্তরাল বা সদৃশ রক্তবাহিকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৭। বিবিধ গবেষণার ফল হিসেবে দেখা যায় শরীরচর্চা মোটের উপর কর্কট (Cancer) রোগের প্রকোপ কমায়। বিশেষত বৃহৎ অন্ত্র ও স্তনের ক্যান্সারের হ্রাস ঘটায়।

৮। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে শরীরচর্চার কারণে (দৌড়, দড়িলাফ) হাড়ের শক্তি বা ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। হাড়ের ঘনত্ব হ্রাসকে (Osteoporosis) প্রতিহত করে। ফলে হাড় ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনাকে প্রভুতভাবে কমিয়ে দেয়।

৯। নিয়মিত শরীরচর্চার কারণে পেশীর নমনীয়তা বৃদ্ধি পায় ও পেশীর টান (Tone) ঠিক থাকে। এর দ্বারা শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা করে। আর এর ফলস্বরূপ বয়স্ক মানুষের আছাড় খাওয়া বা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

১০। নিয়মিত শরীরচর্চা উদ্বেগ (Anxiety) ও অবসাদের (Depression) চিকিৎসায় সহায়তা দান করে। এমনকি উদ্বেগ ও অবসাদকে প্রতিরোধ করে।

১১। অস্থির সন্ধিস্থল (Joints) মানুষের চলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই সন্ধিস্থল সম্পর্কিত রোগে যে স্ফীতি দেখা যায় সেই স্ফীতি কমায় ও প্রদাহজনিত যন্ত্রণা হ্রাস করে।

১২। শৈশবে খেলাধুলা ও শরীরচর্চা শিশুদের ক্ষেত্রে বুদ্ধির বৃদ্ধি ঘটায়। শারীরিক কাজের দক্ষতা বাড়ায়। অস্থি ও পেশীর গঠনে সহায়তা করে।

উপরোক্ত উপকারিতাগুলো ছাড়া পরোক্ষভাবে আরো সাহায্য এই শরীরচর্চা করে থাকে যার বর্ণনা এই পরিসরে করা সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন হল শারীরিক সক্রিয়তা কি?

শারীরিক সক্রিয়তা হল শরীরের ঐচ্ছিক পেশীর সঞ্চালন যার ফলে শরীরের চলন ঘটে এবং যার দ্বারা অন্তর্নিহিত শক্তির খরচ হয়। এক জায়গায় চুপচাপ বসে থাকা শরীরকে নিস্ক্রিয় করে রাখে, সক্রিয় রাখে না। নিরন্তর কাজের মধ্যে থাকা, এ-ঘর ও-ঘর করা, চা করে খাওয়া, নিজে জল ভরে খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা হচ্ছে শরীর সক্রিয় থাকার লড়াই।

এবারে বুঝে নেই শরীর চর্চা কি?

সম্পূর্ণ পরিকল্পিত পুনঃ পুনঃ ঐচ্ছিক পেশীর সঞ্চালন দ্বারা শারীরিক ক্ষমতার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ততা অর্জন করাকে শরীর চর্চা বলা যায়। যেমন হাঁটার দ্বারা বা বৈঠক নামক চর্চার দ্বারা জংঘা ও অনুজংঘার পেশীর শক্তি ও ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে। হাতের পেশীর শক্তি ও ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে ডন জাতীয় ব্যায়ামের দ্বারা। এগুলো শরীরচর্চার দু-একটি উদাহরণ।

শরীরর্চার প্রকারভেদ ঃ

১। সহনশীলতা প্রশিক্ষণ (Endurance / Aerobic Exercise)

২। শক্তিমত্তার প্রশিক্ষণ (Strength / Anaerobic Training)

৩। প্রসারণ বা নমনীয়তা প্রশিক্ষণ (Stretching / Flexibility Training)

৪। ভারসাম্য শিক্ষণ (Balance)

সহনশীলতা প্রশিক্ষণ ঃ

পেশীর পুনঃ পুনঃ সংহত সঞ্চালনের মাধ্যমে যে শরীরচর্চার দ্বারা হৃদপিণ্ড পেশী, রক্তবাহ, ফুসফুস ও ফুসফুসের পেশীর ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি ঘটে সেই চর্চাগুলো সহনশীলতা শিক্ষণের মধ্যে পড়বে। এই শরীরচর্চার দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটে। শরীরচর্চার ফলে মস্তিষ্কে বিটা-এনডরফিন ও অন্যান্য রাসায়নিক বস্তুর নিঃসরণ

ঘটে। এই যৌগগুলো মনের মধ্যে ফুর্তি ভাব আনে, শরীর ঠিকঠাক আছে মনে করায়। এর ফলে মনের উদ্বেগ, মানসিক চাপ হ্রাস পায়। এই জাতের শরীরচর্চার উদাহরণ হিসেবে পড়বে একটু জোরে হাঁটা, জগিং করা, সাইকেল চালানো, নাচ করা, সাঁতার কাটা, বল খেলা (টেনিস, বাস্কেট বল, ফুটবল), ব্যাডমিন্টন খেলা ইত্যাদি।

শক্তিমত্তার প্রশিক্ষণ ঃ

পেশীর মাঝারি থেকে অতিরিক্ত সংকোচন-প্রসারণ যখন ঘটে তখন যে বিপাকীয় প্রক্রিয়া চলে তার ফলে পেশীতে ল্যাক্টিক অ্যাসিড বা ল্যাক্টেট জমতে থাকে। অক্সিজেন সরবরাহ এই ল্যাক্টিক অ্যাসিড বা ল্যাক্টেট যৌগকে সরিয়ে ফেলতে পারে না। পেশীর অতিরিক্ত এই কাজ অক্সিজেন নির্ভর নয়। এই ধরনের শরীরচর্চায় পেশীর সহনশীলতার পরিবর্তে পেশীর গতি ও ক্ষমতা বা শক্তির বৃদ্ধি ঘটে। প্রতিরোধ বা বাধার বিরুদ্ধে এই ব্যায়াম করা হয়ে থাকে। তাই এই শরীরচর্চাকে প্রতিরোধ প্রশিক্ষণ (Resistance Training) জাতের ব্যায়ামও বলা হয়। ভারী ওজন তোলা বা ডাম্বেল তুলে বাহুর পেশীকে পোক্ত করা উক্ত ধরনের ব্যায়াম বলা যায়। ডন, বৈঠক, ওজন তোলা, দৌড়ানো, দড়ি লম্ফন ইত্যাদি ব্যায়াম শক্তিমত্তার প্রশিক্ষণ হিসেবে গণিত হবে। হাড় ও পেশীর বৃদ্ধি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে এই ব্যায়াম খুব কার্যকরী। রক্ত নালীর প্রসারণ ঘটিয়ে উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। শরীরের সপক্ষে লিপিড পরিবর্তনে এই ব্যায়াম কার্যকরী ভূমিকা নেয়।

প্রসারণ বা নমনীয়তা প্রশিক্ষণ ঃ

ক্রীড়াবিদ, বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষজন, শল্যচিকিৎসার উত্তরপর্বে রোগীরা এই প্রসারণ বা নমনীয়তা প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেন। স্কন্ধ ও উর্ধ্ববাহুর প্রসারণ (Shoulder and Upper Arm Stretching), পায়ের গুলির প্রসারণ (Calf Stretching), যোগাসনে প্রসারণ জাতীয় শরীরচর্চা হল প্রসারণ বা নমনীয়তা প্রশিক্ষণের উদাহরণ। এই ব্যায়ামগুলোর দ্বারা নমনীয়তা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চলন বৃদ্ধি পায়। মূল ব্যায়ামের আগে এই প্রসারণ চর্চা পেশী ও অস্থি সন্ধিস্থলের জড়তা কমায় এবং চলনের বৃদ্ধিতে সহযোগী হিসেবে কাজ করে। নরম অঙ্গকলার ক্ষত বা হাড়ের শল্যচিকিৎসার পর অঙ্গকলা বা হাড়ের পুনঃ সংস্থাপনের জন্য এই প্রসারণ ব্যায়াম খুব কার্যকরী। টানযুক্ত পেশীকে নরম করতে এবং সঠিক শারীরিক অবস্থানকে রক্ষা করতে বুকের প্রসারণ, কটিদেশের প্যাচানো প্রসারণ ইত্যাদি খুব কাজের ব্যায়াম।

ভারসাম্য শিক্ষণ ঃ

বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই জাতীয় ব্যায়াম খুব উপকারে আসে। এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা, এক সরল রেখায় গোড়ালি-বুড়ো আঙ্গুলে হাঁটা, এক পায়ের সামনে আর এক পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি শরীরের ভারসাম্য রক্ষায় বড় ভূমিকা নেয়। 'তাই চি' নামের একটি বাইরে থেকে আগত নতুন জাতের শরীর চর্চা শরীরের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে বলে বলা হয়ে থাকে।

দেহের সুস্থতা, ঠিক থাকা ও ওজনহ্রাসের জন্য সাধারণ কিছু ব্যায়াম ব্যবস্থা ঃ

যে কোন বয়স ও যে কোন লিঙ্গের মানুষের সাধারণ কিছু বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকার জন্য জীবন যাপনে কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে।

১। কোথাও হেঁটে যাওয়ার পরিস্থিতি থাকলে গাড়িতে না গিয়ে হেঁটে যান।

২। কোন নিষেধ না থাকলে লিফট বা চলমান সিড়ির বদলে হাঁটার সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা করুন।

৩। গাড়ির পার্কিং বাড়ি থেকে দূরে রাখলে একটু হাঁটার সুযোগ তৈরী হয়। পার্কিং দূরে করুন।

৪। বাড়িতে নিজের কাজ নিজে করুন। জল না চেয়ে নিয়ে খান, কলম না চেয়ে নিয়ে নিন।

৫। কলিং বেল না টিপে, ফোনে সহকর্মীকে না ডেকে নিজে উঠে গিয়ে কথা বলে আসুন বা ডেকে নিয়ে আসুন।

৬। বসে বসে যারা কাজ করেন তারা আধঘন্টা পর পর উঠে একটু বিরতি নিন।

৭। শরীর সক্রিয় রাখার জন্য ফোনে কথা বলার সময় হাঁটুন, অপেক্ষাকালে একপায়ে দাঁড়িয়ে থেকে ভারসাম্যের পরীক্ষা দিতে থাকুন।

৮। দূরদর্শন দেখার সময় বা অন্য যে কাজে শরীর যুক্ত নয় তখন লাফদড়ি বা শরীরচর্চা চালিয়ে যান।

৯। পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সাঁতার কাটতে যান, কুকুর নিয়ে হাঁটান, খেলাধুলায় সময় দিন।

শারীরিক সক্রিয়তার প্রস্তাব ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) স্বাস্থ্যের জন্য যে শারীরিক সক্রিয়তার প্রস্তাব রেখেছেন তা ঠিক ঠিক অনুসরণ করতে পারলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং রোগ প্রতিরোধ করবে। বয়সভেদে এই চর্চাগুলোকে তিনটে ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে, সকল জাতিসত্তার মানুষেরা এই শরীরচর্চায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং করা উচিত।

প্রথম ভাগ ঃ ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সের নারীপুরুষ

১। এক দিনের সময়কালে মাঝারি থেকে জোরালো কাজের মধ্যে থাকতে হবে এক ঘন্টা বা ৬০ মিনিট সময়কাল।

২। এর বেশী সময় যদি শরীরচর্চার মধ্যে থাকেন তাহলে তিনি বা তারা অতিরিক্ত উপকারিতা পাবেন।

৩। বেশীরভাগ সক্রিয়তার চর্চাগুলো হবে সহনশীলতা প্রশিক্ষণ (Endurance / Aerobic Exercise)। সপ্তাহে তিনদিন পেশী ও হাড়ের শক্তি বৃদ্ধির জন্য জোরালো শরীরচর্চা করার প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ ১৮ থেকে ৬৪ বছর বয়সের নারীপুরুষ

১। মাঝারি মানের শরীরচর্চা সপ্তাহে ১৫০ মিনিট ধরে করা উচিৎ। জোরালো মানের চর্চার ক্ষেত্রে এই সময় কাল কমিয়ে সপ্তাহে ৭৫ মিনিট করা যেতে পারে। মাঝারি ও জোরালো মানের চর্চার মিশ্রণও হতে পারে।

২। সহনশীলতা প্রশিক্ষণ ১০ মিনিটের খেপে খেপে হওয়া উচিৎ।

৩। অতিরিক্ত স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকারিতার জন্য মোট মাঝারি মানের ব্যায়ামের পরিমাণ ৩০০ মিনিট করা যেতে পারে। জোরালো ব্যায়ামের ক্ষেত্রে সপ্তাহে ১৫০ মিনিট রাখা যেতে পারে।

৪। বড় পেশীগুলোর ব্যায়ামের ক্ষেত্রে পেশীশক্তি বর্ধনকারী চর্চা সপ্তাহে দুই বা তার অধিক দিন করা উচিৎ।

তৃতীয় ভাগ ঃ ৬৫ বছর বা তার অধিক বয়সী মানুষের জন্য ঃ

১। উপরোক্ত ব্যায়ামগুলো ছাড়া ভারসাম্য বাড়ানোর জন্য সপ্তাহে তিন-চার দিন ভারসাম্য রক্ষার চর্চা করতে হবে।

২। ব্যায়াম করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হলে শরীরকে সক্রিয় রাখার জন্য নিজের সাধারণ প্রয়োজনে যা ঘরে করে থাকি তা নিজে নিজে করতে থাকুন। বাড়ি ঘর পরিষ্কার রাখা, ঘর গোছানো, উঠোন ঝাঁড় দেওয়া, বাড়ির চারপাশ হেঁটে হেঁটে দেখা ইত্যাদি চালিয়ে যেতে হবে যাতে শরীর সক্রিয় থাকে।

ওজন হ্রাসের জন্য শরীরচর্চা ঃ

ওজন হ্রাসের জন্য শরীরচর্চা প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। শরীরের ওজন নির্ভর করে খাদ্য ও বিবিধ পানীয় গ্রহণ ও সেই খাদ্য এবং পানীয়ের শারীরিক খরচের ওপর। এই গ্রহন ও খরচের একটা ভারসাম্য চলতে থাকে। গ্রহণ বাড়লে ওজন বাড়বে এবং খরচ বাড়লে ওজন হ্রাস পাবে। খাদ্য ও পানীয়ের গ্রহণ এবং শারীরিক খরচ সমান সমান হলে শরীরের ওজন একই থাকবে।

শারীরিক ওজনের ভারসাম্যহেতু যা (সমীকরণ) বিবেচিত হয় তা নিম্ন লিখিতভাবে বোঝানো যায়।

খাদ্য গ্রহণের দ্বারা গৃহীত শক্তি = বিশ্রামকালীন স্বাভাবিক শক্তির খরচ + শারীরিক সক্রিয়তার জন্য শক্তির খরচ +খাদ্য পরিপাক-করণে শক্তির খরচ + বৃদ্ধি জনিত কারণে শক্তির খরচ।

আমরা যদি এই সমীকরণটি ঠিক ঠিক পর্যবেক্ষণ করি তবে দেখতে পাবো খাদ্য গ্রহণের দ্বারা গৃহীত শক্তি এবং শারীরিক সক্রিয়তার জন্য শক্তির খরচ দুটির বিষয়ে একমাত্র পরিবর্তন সম্ভব। বাকি দুটি বা তিনটি বিষয়ে কোন পরিবর্তন আনা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং ওজন হ্রাস করার জন্য যেখানে যেখানে পরিবর্তন সম্ভব সেখানে সেখানে ওজন হ্রাসের পক্ষে পরিবর্তন করতে হবে। এই কথাগুলোর এখানে মানে হল, হয় খাদ্য ও পানীয়গ্রহণ কমাতে হবে বা শারীরিক সক্রিয়তার ক্ষেত্রে শরীরচর্চা বাড়াতে হবে। অথবা এই দুটি বিষয়ই একসঙ্গে পালন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া এককভাবে বা একসঙ্গে পালন করলে তবে শরীরের ওজন কমানোর ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।

যোগা ও স্বাস্থ্য ঃ

যোগা (Yoga) একটি বহু আলোচিত বিষয়। ভারতীয় সভ্যতায় জীবনচর্চার যে বিকশিত কুসুমের মতো উপহার মানুষের জন্য এসেছে তা হল এই যোগা। প্রাসঙ্গিকভাবে এই পরিসরে যোগা বিষয়ে একটা অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে রাখা দরকার।

যোগা হল জীবাত্মার (Individual Soul) সাথে পরমাত্মার (Universal Soul) মিলন। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন যোগা হল চিত্ত বৃত্তি নিরোধ। মানে যোগা হল মনের চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি। যোগায় মনের শান্তভাবের উদয় হয়, যোগার দ্বারা কর্ম কুশলতা কৌশলের জন্ম হয়, যোগা গুপ্ত-রহস্যকে ধ্বংস করতে সাহায্য করে। যোগা আত্মোপলব্ধিকে অনুভব করায়, মোক্ষলাভের পথ দেখায়। ২০১৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি মহাশয়ের প্রস্তাবনায় ২১শে জুনকে ‘‘আন্তর্জাতিক যোগা দিবস’’ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যোগার সাথে স্বাস্থ্যের যে নিবিড় সম্পর্ক তা বোঝানো যায় আন্তর্জাতিক স্তরে এই বিষয়টিকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে।

ঐতিহাসিকতার নিরিখে যদি দেখা হয়, তবে দেখবো যোগা খৃষ্টপূর্ব ২৭০০ বছর আগে প্রাক-বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। বেদ ও উপনিষদে যোগার উল্লেখ সুবিদিত আছে।

অষ্টাঙ্গ যোগা, আসন (যোগাসন), প্রাণায়াম, ধ্যান ইত্যাদি হল যোগার বিভিন্ন রূপ। অষ্টাঙ্গ যোগায় আটটি পথে সমাধিপ্রাপ্ত (আলোকপ্রাপ্ত) হওয়ার কথা মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন।

আসন (যোগাসন) আবার ধ্যানসংশ্লিষ্ট (Meditative) এবং শরীরবৃত্তীয় (Physical) প্রকারের হয়। যোগাসন দাঁড়িয়ে করা যেতে পারে, বসে করা যায়, উপুড় হয়ে শুয়ে এবং চিৎ হয়ে শুয়েও করা যায়।

প্রাণায়াম (প্রাণ=শ্বাস, আয়াম=নিয়ন্ত্রণ) শব্দটি দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ বোঝায়। প্রশ্বাসের মাধ্যমে নানাবিধ গ্যাসের সাথে গুরুত্বপূর্ণ জীবনীশক্তি প্রবেশ করে বলে ধরা হয়। প্রাণায়ামের তিনটি অংশ হল পুরক (Inhalation), কুম্ভক (Retention), রেচক (Exhalation)। বুক ও পেটের মাঝখানেকার মধ্যচ্ছদাকে প্রাণায়ামে কাজে লাগাতে পারলে শরীরে অধিকতর অক্সিজেন পাওয়া সম্ভব। এইটিকে যোগাযুক্ত প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস বলা হয়। এই প্রকারের প্রাণায়ামে শরীরে লেপটিন নামক অন্তক্ষরিত রাসায়নিকের প্রভাবে ক্ষুধা নিবৃত্তিতে সহায়তা করে। দুই শতাধিক রকমের প্রাণায়াম বর্ণিত আছে।

ধ্যান যোগা কর্মের আর একটি উপাদান। ধ্যান মূলত জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোকে প্রশিক্ষণ দেয় এবং ফলে তারা নিয়ন্ত্রিত থাকে। বিভিন্ন বস্তু থেকে মনকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং মন সাক্ষী হিসেবে কোন নির্লিপ্ত অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। উদ্বেগ হ্রাস করতে, মনের চাপ কমাতে, উচ্চ রক্তচাপ কমাতে হৃদস্পন্দনের হার ঠিক রাখতে, শ্বাসের হার কমাতে এই ধ্যান খুব সাহায্য করে।

জীবনশৈলী সংক্রান্ত যে রোগগুলো আমাদেরকে আক্রান্ত করে সেই রোগগুলো এই যোগার সহযোগে হ্রাস করা সম্ভব, প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং জীবনশৈলী সংক্রান্ত যে রোগগুলো আছে তা দূরে সরিয়ে আমাদেরকে স্বাভাবিক করে তোলায় সাহায্য করে।

অ্যানিমিয়া (রক্তাল্পতা)

ডঃ সুপ্রিয় কুন্ডু, MBBS

রক্তাল্পতা হল এমন একটি অবস্থা, যেখানে লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা অথবা সেগুলোর ভেতরের হিমোগ্লোবিনের ঘনত্ব স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকে। এটা মূলত নারীদের এবং বাচ্চাদের প্রভাবিত করে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কলায় অক্সিজেন পরিবহনের জন্য পর্যাপ্ত হিমোগ্লোবিন না থাকলে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। এমনকি রক্তস্বল্পতা শিশুদের জ্ঞানীয় ও শারীরিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এটি গর্ভবতী নারী ও তাঁদের শিশুদের জন্যও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। পুষ্টিহীনতা, সংক্রমণ, দীর্ঘস্থায়ী রোগ, অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, গর্ভাবস্থাজনিত সমস্যার কারণে রক্তাল্পতা দেখা দিতে পারে। রক্তে আয়রনের অভাবে এটি ঘটে থাকে।

- **রক্তাল্পতার মান ঃ**

	<u>পুরুষদের ক্ষেত্রে</u>	<u>নারীদের ক্ষেত্রে</u>
হিমোগ্লোবিন	<13.6 gm/dl	<12gm/dl
হিমাটোক্রিট ভ্যালু	<41%	<36%

- **সমস্যার পরিধি ঃ** রক্তাল্পতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক ঝুকিপূর্ণ হল, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুরা—বিশেষ করে দুই বছরের কম বয়সী শিশুরা, ঋতুস্রাবরত কিশোরী, মহিলা এবং গর্ভবতী ও প্রসব পরবর্তী নারীরা এবং ৬৫ বছরের বেশী নারী ও পুরুষ।

  বিশ্বজুড়ে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী ৫০০ মিলিয়ন নারী এবং ৫ বছরের কম বয়সী ২৬৯ মিলিয়ন শিশু রক্তাল্পতায় আক্রান্ত। ২০১৯ সালের গণনা অনুযায়ী, ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী গর্ভবতী নন এমন ৩০ শতাংশ নারী এবং ৩৭ শতাংশ গর্ভবতী নারীরা রক্তাল্পতায় আক্রান্ত ছিলেন।

- **উপসর্গ ঃ** রক্তাল্পতার প্রধান উপসর্গগুলি হল—
  - দুর্বলতা
  - শ্বাসকষ্ট
  - ক্লান্তি
  - মাথা ব্যথা
  - শারীরিক কর্মক্ষমতা হ্রাস
  - মাথাঘোরা বা হালকা বোধ করা
  - হাত ও পা ঠান্ডা হওয়া

তীব্র রক্তাল্পতার (Severe Anemia) কারণে আরো কিছু গুরুতর উপসর্গ দেখা যায়—

- মুখ, নাক, জিহ্বা ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া।
- ত্বক ও নখের নীচের অংশের ফ্যাকাশে ভাব।
- Brittle nails, Spooning of nails (Koilorychia)
- দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদস্পন্দন।
- দাঁড়িয়ে ওঠার সময় মাথা ঘোরা (Dizziness)
- শরীরে সহজে কালশিটে পড়ে যাওয়া।

কারণ ঃ রক্তাল্পতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে।

- **পুষ্টির অভাব (আয়রনের অভাব) ঃ** খাদ্যের মাধ্যমে অপর্যাপ্ত আয়রন গ্রহণের কারণে সৃষ্ট আয়রনের অভাবকে রক্তাল্পতার সবচেয়ে সাধারণ পুষ্টিগত ঘাটতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণ এবং লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদনে ভিটামিন A, ফোলেট, ভিটামিন B-12 এবং রাইবোফ্লাভিনের নির্দিষ্ট ভূমিকার কারণে এগুলোর অভাবেও রক্তাল্পতা হতে পারে।

- **অপর্যাপ্ত খাদ্যাভ্যাস (পুষ্টি উপাদানের অপর্যাপ্ত শোষণ)** (Inadequate diet & inadequate absorption of nutrients)

- **সংক্রমণ (Infection) ঃ** মূলত ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, এইচ আই ভি এবং পরজীবী সংক্রমণ।

  সংক্রমণ, পুষ্টি শোষণ ও বিপাক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে যেমন ম্যালেরিয়া, অ্যাসকারিয়াসিস) অথবা পুষ্টি ক্ষয়ের কারণে হতে পারে (সিস্টোসোমিয়াসিস, হুক ওয়ার্ম)

- **প্রদাহ (Inflammation) ঃ**
- **দীর্ঘস্থায়ী রোগ (Chronic Disease) ঃ** IBD, Malignancy Rheumatological Disease.
- **স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি সংক্রান্ত সমস্যা ঃ** প্রসবকালীন রক্তক্ষরণ, মাসিকের সময় রক্তক্ষরণ, জন্মের সময় শরীরে আয়রনের স্বল্পতা ইত্যাদি।

- **লোহিত রক্তকণিকার বংশগত ত্রুটি (Inherited Red Blood Cell Disorders) ঃ**
  এর মধ্যে রয়েছে—হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষনে ত্রুটির কারণে সৃষ্ট α এবং β—থ্যালাসেমিয়া, হিমোগ্লোবিন গঠনে পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সিকেল সেল ব্যাধি, হিমোগ্লোবিন জিনের ভিন্নতার কারণে সৃষ্ট অন্যান্য হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি, লোহিত রক্তকণিকার এনজাইমে অস্বাভাবিকতা অথবা ঝিল্লিতে (Membrane) অস্বাভাবিকতা।

- প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ হল আয়রনের অভাবজনিক রক্তাল্পতার মূল কারণ।

- **চিকিৎসা ঃ** চিকিৎসা ও প্রতিরোধ নির্ভর করে এই অবস্থার মূল কারণগুলির ওপর—
  - মূলত খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন রক্তাল্পতা কমাতে সহায়তা করে।
  - আয়রন, ফোলেট, ভিটামিন B-12, ভিটামিন A এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা। ডাল জাতীয় শস্য, মাছ, মুরগীর মাংস, গাঢ় সবুজ শাকসবজি, বিভিন্ন ফল, শিম ইত্যাদি।
  - নানা ধরনের খাবার সমন্বিত একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা।
  - ম্যালেরিয়া, সিস্টোসোমিয়াসিস, কৃমি দ্বারা সৃষ্ট সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করা।
  - ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। ভালো করে সাবান ও জল দিয়ে হাত ধোয়া, পরিষ্কার শৌচাগার ব্যবহার করা।
  - স্থূলতা ও হজমজনিত (Digestive problem) সমস্যার মত দীর্ঘস্থায়ী রোগগুলি নিয়ন্ত্রণ করা।
  - গর্ভাবস্থা থেকে পরবর্তী গর্ভাবস্থার মধ্যে অন্তত ২৮ মাস বিরতি দেওয়া এবং অনাকাঙ্খিত গর্ভাবস্থা রোধে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা।
  - অতিরিক্ত ঋতুস্রাব এবং প্রসবের আগে ও পরে রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করা।
  - সিকেল সেল ডিজিজ এবং থ্যালাসেমিয়ার মত বংশগত ব্যাধিগুলোর চিকিৎসা করা।
  - প্রয়োজনীয় ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রহণ করা এবং নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করা।

পরিণতি ঃ রক্তাল্পতার ফলাফল বা পরিণতি নানারকম হতে পারে—এটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে—যেমন, তাদের বিকাশে বিলম্ব (Developmental Delays), আচরণগত সমস্যা, শারীরিক সক্রিয়তা ও সামাজিক মেলামেশা কমে যাওয়া এবং কোনো কাজে মনোযোগের অভাব।

এটি প্রাপ্ত বয়স্কদের কর্মক্ষমতা এবং সামগ্রিকভাবে জীবনের মানের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

গর্ভাবস্থায় রক্তাল্পতার সাথে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যের নেতিবাচক ফলাফলের সম্পর্ক আছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—সময়ের আগেই সন্তান প্রসব, জন্মকালীন ওজন কম হওয়া এবং প্রসূতি মৃত্যু।

স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ছাড়াও, রক্তাল্পতা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রভাবও ফেলতে পারে।

মনের কথা

শ্রীমতি চিরশ্রী দত্ত, সাইকোলজিস্ট, MSC (Psychology), PGDRP

আমাদের পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হলে আমরা সাধারণত জিজ্ঞাসা করি ''কি শরীর কেমন আছে?'' কখনও কি জিজ্ঞাসা করেছি যে ''আচ্ছা আপনার মন কেমন আছে?'' বোধহয় নয় অথবা খুব কম। আমরা শরীর নিয়ে খুব চিন্তিত, উদ্বিগ্ন মন নিয়ে অতটাও নয়। শরীর খারাপ হলে আমরা জানি কি করতে হবে কিন্তু মন খারাপ কে আমরা পাত্তাও দিই না। অথচ ভারতীয় দর্শনে, চড়ক সংহিতায়, ভাগবত গীতাতে বার বার উঠে এসেছে শরীর ও মন এর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা। শরীর ও মনকে দুটি আলাদা এন্টিটি হিসাবে দেখে না, বরং মন হলো সূক্ষ্ম পদার্থ এবং শরীর হলো তার স্থুল প্রকাশ এবং একে অপরকে ক্রমাগত প্রভাবিত করে।

সত্ত্বমাত্মা শরীরাম চ ত্রয়মেতত্রিদন্ডবত।
লোকস্তিষ্ঠাতি সংযোগত্তাত্র সর্বম প্রতিস্থাম্।।

মন, আত্মা ও শরীর হলো জীবনের তিনটি স্তম্ভ। এদের মিলনের মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্ব টিকে থাকে এবং এর সমন্বয়ের জন্যই সবকিছু দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সুস্থ জীবনযাপনের জন্য মন, আত্মা ও শারীরিক সুস্থতা—এই তিনটিরই ভারসাম্য থাকা অত্যন্ত জরুরি।

তাই আমরা যেরকম আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিই তেমনি আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

এবারে প্রশ্ন হচ্ছে মেন্টাল হেলথ বা মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝায়? WHO-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ''মানসিক স্বাস্থ্য হলো এমন এক মানসিক সুস্থতার অবস্থা যা আমাদের জীবনের বিভিন্ন ধরনের চাপের সঙ্গে মোকাবিলা করতে, নিজের ক্ষমতাগুলিকে উপলব্ধি করতে, ভালোভাবে শিখতে ও কাজ করতে এবং সমাজে কোনো অবদান রাখতে সাহায্য করে।''

অর্থাৎ সোজা ভাষায় বলতে গেলে এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে কোনো মানসিক রোগের উপস্থিতি নেই, মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন কাজগুলি নির্বিঘ্নে করতে পারছে এবং প্রতিদিনের জীবনের যা সমস্যা সেগুলিকেও সমাধান করতে পারছে।

কিন্তু আপনি কি করে বুঝবেন আপনি বা আপনার কাছের কেউ বা পরিচিত কোনো ব্যাক্তি মানসিকভাবে অসুস্থ বা মানসিক রোগাক্রান্ত কি না? মানসিক রোগের ধরন অনুযায়ী লক্ষণগুলি ও ভিন্ন হয়। তবে চিন্তা-ভাবনা, মন-মেজাজ ও আচরণগত কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যা দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করে। সাধারণত কিছু ওয়ার্নিং symptoms যা কম বেশি সকলের ক্ষেত্রেই দেখা যায় সেগুলি হলো—

১) মেজাজের পরিবর্তন / মুড সুইং—অনেকদিন ধরে মন খারাপ / বিষন্নতা, অল্প কথায় রেগে যাওয়া, অল্পতেই বিরক্ত হয়ে যাওয়া, হতাশা।

২) সোশ্যাল উইথড্রল—বন্ধুদের থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া, পছন্দের কাজগুলোয় ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলা। বাড়ির লোকদের থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেওয়া, কথা কম বলা, বাইরে কম বেরোনো / সোশালাইজেশন কম করা।

৩) খিদে / ঘুমের পরিবর্তন—অতিরিক্ত খাবার খাওয়া, আগের থেকে খাবার কম খাওয়া, ওজন কমে বা বেড়ে যাওয়া, ঘুম কমে বা বেড়ে যাওয়া।

৪) কোনো কাজে মনোযোগ দিতে অসুবিধা / ভুলে যাওয়ার প্রবণতা।

এগুলি ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিম্পটম হলো—

- কোনো কারণ ছাড়াই ভয় পাওয়া বা অমূলক ভয়
- অতিরিক্ত সন্দেহবাতিক
- আত্মহত্যার প্রবণতা
- অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনা করা
- সারাক্ষণ মাথায় কোনো চিন্তা ঘুরপাক খাওয়া
- ভ্রম ও অলীক কল্পনা
- অবাস্তবতার অনুভূতি, বাস্তব থেকে দূরে সরে যাওয়া
- বাতিকগ্রস্থ—বারবার করে পরিষ্কার করা, বার বার হাত ধোয়া, অনেকক্ষণ ধরে স্নান করা ইত্যাদি পড়াশুনা করতে না চাওয়া / স্কুল না চাওয়া ইত্যাদি।

আবার মানসিক রোগের কিছু শারীরিক সিম্পটম ও লক্ষ্য করা যায়। যেরকম—

- বুক ধড়ফড় করা
- নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট / শ্বাসকষ্ট
- হাত পা কাঁপা
- হাত পা ঝিন ঝিন করা
- মাথা ঘোরানো
- মাথাব্যথা
- পিঠে, ঘাড়ে ব্যথা
- সারাদিন ক্লান্তি ভাব, দুর্বলতা
- ঘুমে ব্যাঘাত / ঘুম পর্যাপ্ত পরিমাণে না হওয়া
- হজমের সমস্যা
- বুকে চাপ বা ভারী ভাব অনুভব করা
- শরীরে এক ধরনের অস্বস্তি, অস্থিরতা অনুভব করা ইত্যাদি।
- শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যথা অথবা দীর্ঘস্থায়ী সারা শরীরে ব্যথা

এই ধরনের শারীরিক সিম্পটমের ক্ষেত্রে আমরা চিকিৎসকের কাছে যাই, তবে অনেক ক্ষেত্রেই এগুলির কোনো শারীরবৃত্তীয় কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না এবং দীর্ঘদিন চিকিৎসার পরেও দেখা যায় সিম্পটমগুলি বার বার ফিরে আসে, বিশেষ করে যখন আমরা কোনো মানসিক চাপের / ঘটনার সম্মুখীন হই।

উপরিউক্ত সিম্পটমগুলির যদি একের অধিক আপনি নিজের বা অন্য কারোর মধ্যে লক্ষ্য করেন এবং সেটা যদি দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করে তাহলে আপনাকে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালের সাথে যোগযোগ করতে হবে। মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদের মধ্যে রয়েছেন সাইকিয়াট্রিস্ট, সাইকোলজিস্ট সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলর।

মনে রাখবেন, চিকিৎসার মাধ্যমে মানসিক রোগ থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব। কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ এবং থেরাপির সমন্বয়ের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করা যায় তবে আমাদের জীবনযাত্রায় কিছু উপায় অবলম্বন করতে পারলে আমরা মানসিক রোগকেও কিছু দূরে রাখতে পারি, নিজের মনকেও ভালো রাখতে পারি। যেমন ধরুন—

- বাড়ির লোকের বা পছন্দের লোকদের সঙ্গে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করা
- নিজের জন্য / নিজের পছন্দের কাজ করার জন্য আলাদা করে সময় করা
- নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করা বন্ধ করা
- নিয়মিত যোগব্যায়াম / শরীরচর্চা করা
- স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করা
- ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স করা
- অতিরিক্ত চাহিদাগুলো 'না' বলতে শেখা

জীবনযাত্রার পরিবর্তন যদি যথেষ্ট না হয়, আপনি যদি দীর্ঘদিন মানসিক চাপ, অবসাদ / উদ্বেগে ভোগেন সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রফেশনালের সাহায্য নিতে হবে। মনে রাখবেন, আপনি নিজে ভালো থাকলেই অন্যকে ভালো রাখতে পারবেন।

একজন থ্যালাসেমিয়া রোগীর গল্প

[থ্যালাসেমিয়া বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম প্রধান বংশগত স্বাস্থ্য সমস্যা। বিশেষত ভারতে থ্যালাসেমিয়া একটি অত্যন্ত ভয়াবহ ও প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। সারা বিশ্বে যত থ্যালাসেমিয়া রোগী আছেন, তার প্রায় ২৫% ভারতে বাস করেন। প্রতি বছর ৮ মে আন্তর্জাতিক থ্যালাসেমিয়া দিবস (International Thalassaemia Day) পালিত হয়। থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত রক্তের রোগ—এই রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং রোগীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যেই দিবসটি বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয় সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে রক্ত দান শিবির, সেমিনার বা আলোচনা সভা আয়োজন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ৮ মে, ২০২৬-এ পালিত আন্তর্জাতিক থ্যালাসেমিয়া দিবসে এ বছরের বৈশ্বিক প্রতিপাদ্যঃ "আর গোপন নয় ঃ অশনাক্তকে খুঁজে বের করা। অদেখাকে সহায়তা করা।"।

কিন্তু সত্যি সত্যি এই মারণ রোগ প্রতিরোধে আমরা কতটা সচেতন, রোগীদের প্রতি কতটা সংবেদনশীল, সামাজিক বা মানসিকভাবে এই রোগীদের প্রকৃত অবস্থান কি—তার সুলুক সন্ধানে নিমতা ডাঃ অমিতাভ বসু স্মৃতিরক্ষা কমিটির তরফে আমরা গিয়েছিলাম আমাদের একনিষ্ঠ কর্মী থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শ্রীমতি সঙ্গীতা দে-র কাছে। ডাঃ অমিতাভ বসু স্মৃতি স্বাস্থ্যরক্ষা কেন্দ্রের সক্রিয় স্বাস্থ্য সহায়িকা (Health Assistant) হিসাবে কর্মরত শ্রীমতি সঙ্গীতা দে নিজের ভাষায় আমাদের জানিয়েছেন তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা।]

আমি সঙ্গীতা দে, ডাঃ অমিতাভ বসু স্মৃতি স্বাস্থ্যরক্ষা কেন্দ্রের নিয়মিত কর্মী।

আজকে আমি আমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ছোট্ট এক গ্রামের নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বাবার কর্মসূত্রে ছোটবেলা থেকেই কলকাতা শহরে ভাড়া বাড়িতে আমার বড় হয়ে ওঠা। সাল বা বয়স কিছুই তেমন মনে নেই, শুধু মনে আছে—তখন আমি ক্লাস টু তে পড়ি। হঠাৎ একদিন খুব জ্বর হয়। জ্বরের লক্ষণটা আমার মায়ের ঠিক ভালো লাগেনি। মা-র মনে হয়েছিল একটু অন্যরকম কিছু। পরের দিন বিকেল বেলায় মা আমাকে নিয়ে ডঃ অমিতাভ বসু স্মৃতি স্বাস্থ্যরক্ষা কেন্দ্রে ডাক্তার ডাঃ এস কে পাল এর কাছে নিয়ে যান। ডক্টর পাল আমাকে না দেখেই আমার হাত ধরেই বলেছিলেন, এই বাচ্চা মেয়েটার শরীরে এক ফোঁটাও রক্ত নেই। এখনই একে হসপিটালে ভর্তি করে দাও, রক্ত দিতে হবে। পরের দিন মা বাবা আমাকে নিয়ে সোজা চলে আসে নীলরতন হসপিটালে। আমি তখনও জানি না যে আমি হাসপাতালে ভর্তি হতে যাচ্ছি। আমি জানি ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি। যতদূর মনে পড়ে মোটামুটি ছয়-সাত দিন আমি হসপিটালে ভর্তি ছিলাম। দুই প্যাকেট রক্ত আমাকে দেওয়া হয়েছিল। অনেকদিন স্কুলে যেতে পারিনি। হসপিটালে থাকাকালীন একটা রবিবার পড়েছিল, সেদিন আমাকে অনেকেই দেখতে এসেছিল। পাড়া-প্রতিবেশী, পরিচিত অনেকেই এসেছিলেন। হসপিটাল থেকে ছুটি হয়ে বাড়ি আসার পর প্রচুর লোক বাড়িতে দেখা করতে আসে। আমার সেগুলো একদম ভালো লাগতো না। খালি মনে হতো যে, আমার কি এমন হয়েছে যে সবাই খালি আমার সাথে দেখা করতে আসছে! জিজ্ঞেস করছে, তুই ভালো আছিস তো! তোর কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো? কিন্তু আমি তখনও জানি না আমার ঠিক কি হয়েছে।

যখন আমি প্রথম এই রোগটা সম্পর্কে জানতে পারি তখন আমি নিজেই অনেক ছোট। রোগ সংক্রান্ত আমার কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম যে আমার কিছু একটা হয়েছে, যার জন্য আমার বাবা-মা এবং আমার পারিপার্শ্বিক সকলেই আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতেন, সর্বদা আমার পাশে থাকতেন। তবে হ্যাঁ, বাবা মাকে মানসিকভাবে ভীষণভাবে ভেঙে পড়তে দেখেছিলাম। আমার বাবাকে কখনোই আমি মন খারাপ হতে দেখিনি। কিন্তু সেই সময় আমি দেখতাম আমার বাবার মধ্যে কেমন যেন একটা চিন্তার ছায়া আছে। আর আমার মা বরাবরই বড্ড শান্ত প্রকৃতির মানুষ, সেই সময় যেন উনি আরও শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বাবার কর্মসূত্রে আমরা কোলকাতায় থাকতাম ফলে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে খুব কম দেখা হতো। কিন্তু যখনই মেদিনীপুরে আমাদের নিজেদের বাড়িতে যেতাম, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা হতো। কিছু কিছু আত্মীয় পরিজনদের দৃষ্টিকটুভাবে আড় চোখে তাকানোটা এখনো মনে

রয়ে গেছে। তবে সবাই একই রকম ছিলেন না। কিছু কিছু মানুষজন এতটাই করেছিলেন যে, আমরা যে কোনো সমস্যার মধ্যে ছিলাম সেটা কখনো বুঝতে পারিনি। নিজের ভীষণ কাছের একজন খুবই খারাপ ব্যবহার করতেন। আমি মরে গেলেই হয়তো ভালো হতো, আমার বেঁচে থাকাটা ভীষণ পাপের—এটাই উনি মনে করতেন। আমাদের পরিবারের আমার সর্বপ্রথম এই রোগটা ধরা পড়ে কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরিবারের অনেকেই এই বিষয়টা জানতে পারে যে, তাদের মধ্যেও অনেকের এই সমস্যাটি আছে। কিন্তু তফাৎটা হল তারা সবাই থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার আর আমি মেজর ই বিটা থ্যালাসেমিয়া রোগী অর্থাৎ সম্পূর্ণ একজন রোগী যাকে তার প্রয়োজন মতন রক্ত দিতে হয়।

থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর অনেক অপরিচিত মানুষের সাথে আলাপ হয়। সত্যি বলতে, এখন তাদের মধ্যে বেশ কিছু জন যেন আমার নিজের আত্মীয়র থেকেও বেশি জায়গা জুড়ে আছে। তাদেরই মধ্যে একজনের ঘটনা মনে পড়লে মনটা খুব নাড়া দিয়ে ওঠে। একটি বাচ্চা ছেলে বয়স হয়তো তখন ১০-১১ বছর। সে এবং তার পরিবার যেদিন জানতে পারে যে ছেলেটা এই রোগে আক্রান্ত, তার বাবা সেই মুহূর্তে তাকে এবং তার মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এটা ভাবা যায় না যে কোন সন্তানের বাবা সন্তান অসুস্থ হওয়ার কারণে তাকে ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু ঘটনাটা পুরোপুরি সত্য। আরো একটা ঘটনা মনে আছে, সেটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। সন্তান থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তার মা আত্মহত্যা করেন। ফলে মাতৃহারা বাচ্চাটিকে একা নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হলো। তাই সকলের কাছে বিনীত নিবেদন, কেউ বিষয়টিতে ভয় না পেয়ে এগিয়ে চলুন। লড়াইটা কঠিন ঠিকই কিন্তু সবাইকে সকলের পাশে থেকে পথটাকে সহজ করে তুলতে হবে।

অন্য সকলের মত, কুড়ি-একুশ বছর বয়স থেকে আমাদের পরিবারের মেয়েদের বিয়ের জন্য সম্বন্ধ দেখা শুরু হয়। প্রথম থেকেই আমার বাবা-মা আমার রোগ সম্পর্কে কোন কথাই গোপন করেননি। খুব স্বাভাবিক, সবার পক্ষে বিষয়টা মেনে নেওয়া সম্ভব হতো না। একের অধিক পরিবার বিষয়টা বুঝতে পারতেন না অথবা বুঝলেও মেনে নিতে পারতেন না। বাড়িতে বিবাহযোগ্যা মেয়ে থাকলে সব মা-বাবার দুশ্চিন্তা খুব স্বাভাবিক। এমন অবস্থায় আমার বাবা-মাও খুব ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু দুনিয়ার সব মানুষ যে বোঝেন না তা তো হয় না! শেষ পর্যন্ত আমার দেখে-শুনে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়। আমার জীবনে এই আদর্শ ব্যক্তিটির আগমন হয় যে কিনা আমার সমস্ত সমস্যার কথা শুনেও আমাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত হন। এখন আমি তার সাথে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ, আমাদের একটি কন্যা সন্তান আছে। শুনেছি, বিভিন্ন মানুষের এই পরিস্থিতিতে খুবই প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আমার স্বামী বা নতুন পরিবারের কেউই কখনো আজ পর্যন্ত আমাকে আমার রোগ সম্পর্কে বিব্রতকর কোন প্রশ্ন করেননি। শুধু এটুকুই বলেছেন, তুমি তোমার মত সুস্থ থেকো এবং ডাক্তারের মতামত নিয়ে চলো। আমি আমার দ্বিতীয় পরিবারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছি সমস্ত কিছুতে। উনারা আমাকে সব সময় সব বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন, কোনো কিছুতে উনারা কখনো বাধা দেননি। এ আমার পরম সৌভাগ্য।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা না বললে এই লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি তখন সদ্য অন্তঃস্বত্ত্বা। স্বাভাবিক ভাবেই ডাক্তারবাবু পরামর্শ দেন গর্ভের সন্তানের ভ্রুণ পরীক্ষা করে দেখার জন্য—সে সুস্থ নাকি থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার স্বামী আমাকে বলেন, পরীক্ষা করার কোন দরকার নেই। যে আসছে সে আসুক, সুস্থ হোক আর অসুস্থ হোক তাকে আমরা সাদরে গ্রহণ করে নেব। অসুস্থ হলে চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ করে তুলব আমাদের ভালোবাসার সন্তানকে।

পরিশেষে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের সবার কাছে একটাই অনুরোধ, আপনারা একটু সচেতন হোন, অন্যকে সচেতন করুন এবং অনেক অনেক প্রচার করুন। থ্যালাসেমিয়া রোগ ছোঁয়াচে নয়। এটি একটি রক্তবাহিত জিনগত সমস্যা, এটা বংশগতভাবেই হয়ে থাকে। বিয়ের আগে কুষ্ঠি বিচার নয়, এইচপিএলসি টেস্ট করে কোনো মানুষ থ্যালাসেমিয়া নামক রোগের বাহক কিনা বা সে এই রোগে আক্রান্ত কিনা সেইটা জানার চেষ্টা করুন। রোগী নিজে কোনরকমভাবে তার রোগের জন্য দায়ী নয়। তাই, রোগীর সাথে রোগীর মতো ব্যবহার না করে সাধারণ মানুষের মতো ব্যবহার করুন। তাকে কখনো বুঝতে দেবেন না যে সে কোনো বিশেষ রোগে আক্রান্ত। সময়, সুযোগ করে তার সাথে কথা বলুন, তার সাথে মিশুন, তাকে সময় দিন। রোগীকে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপনে আন্তরিকভাবে সহায়তা করুন।

—০০—

বর্তমানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়

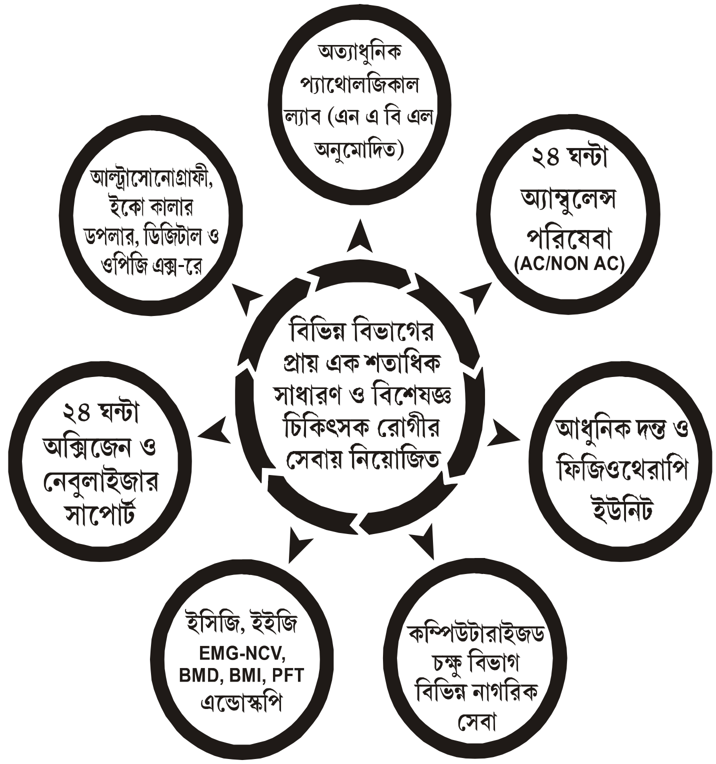

ডাঃ অমিতাভ বসু স্মৃতি স্বাস্থ্যরক্ষা কেন্দ্রে প্রতিদিন গড়ে চার শতাধিক রোগী বিভিন্নরকম চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন।

ডাঃ অমিতাভ বসু স্মৃতি স্বাস্থ্যরক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কে আরও জানতে নিচের কিউ আর (QR) কোড স্ক্যান করুন

SCAN ME!